লম্বকর্ণ গল্পের হাস্যরস

কথায় বলে, ছাগলে কী না বলে পাগলে কী না খায়! পাগলে কী বলে জানা নেই, কিন্তু ছাগল যে সব কিছুই খায়, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'লম্বকর্ণ' গল্পে।

হাসি জীবনের এক বিচিত্র অনুভব। আবার সংক্রামক ব্যাধিও বটে। সংক্রামক এই কারণে, একজনকে হাই তুলতে দেখলে যেমন আমাদের হাই ওঠে, তেমনি একজনকে খিলখিল করে হাসতে দেখলে কিছুক্ষণ পরে আমরাও হাসতে থাকি। কারণ থাকাটা অবশ্য জরুরী নয়। কান্না দেখলে যেমন কান্না পায়, তেমনি হাসি দেখলে হাসি পায়। জীবনের বহু বিচিত্র পর্বে বিভিন্ন কারণে আমরা হাসি। হাসতে হাসতে কারও পেটে ব্যথা ধরে যায়। কিন্তু হাসি আর থামতে চায় না। কারও মুচকি হাসি, কারও কুটিল। কেউ করে অট্টহাস্য, কারও হাসি আবার সরল নিষ্পাপ। কেউ ব্যঙ্গও করে হাসে, কারও হাসি আবার কান্নার চেয়েও করুণ। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, কত অদ্ভুত কারণে আমরা হাসি। সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে একজন দুম করে পড়ে গেল, অমনি সবাই হেসে উঠল। একজনের কষ্ট অন্যজনের হাসির উপাদান হয়ে ওঠে। একজন মানুষের অক্ষমতা অপর মানুষকে হাসির খোরাক যোগায়। আমাদের সমাজে অক্ষমতা দিয়েই এক-একজন চিহ্নিত হয়। যেমন গালফোলা গোবিন্দর মা, অথবা খোঁড়া নিতাই। এক্ষেত্রে তার চেহারার অসংগতি দিয়ে সে সমাজে চিহ্নিত হচ্ছে। তবে আধুনিক ডাক্তারবাবুরা, এমনকি স্বয়ং রামদেব বাবাও এখন মানুষকে হাসতে বলছেন। হাসলে মন ভালো থাকবে আর মন ভা্লো থাকলে শরীর ভালো থাকতে বাধ্য। ভোর বেলায় প্রাতঃভ্রমণে বেরোলেই শোনা যায় একদল মানুষ হা হা হা হা শব্দে আকাশ বাতাস বিদারিত করে চলেছে। এই ব্যস্ততার জীবনে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো মুখ করে থাকার চাইতে অকারণে হাসা অনেক ভালো।

এবার একটু সাহিত্য চর্চায় আসা যাক। হাসি মূলতঃ পাঁচ রকম-

১)Satire - ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক হাসি

2) Pun - শব্দের মজার হাসি

3) Fun - পরিস্থিতিগত মজার হাসি

4) Humour - আবেগ নির্ভর হাসি

5) Wit - বুদ্ধিদীপ্ত হাসি

উৎসগত বৈচিত্র্য অনুযায়ী লেখকদেরও প্রবণতাগত পার্থক্য তৈরি হয়। বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, বনফুল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় – এঁরা সবাই একাধিক হাস্যরসের গল্প লিখেছেন, যদিও তাঁদের গল্পের বিষয় নির্বাচন, আঙ্গিক, উপস্থাপন কৌশল, ভাষা ব্যবহার সবই আলাদা। আর এখানেই তাঁরা স্বতন্ত্র।

আমাদের আলোচ্য বিষয় পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পটি। (গল্পটি আলোচনার আগে রাজশেখর বসু সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার।

১৮৮০ সালে পরশুরামের জন্ম। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এস্টেটে জন্ম। ছোটবেলায় রাজশেখর 'ফটিক' নামে পরিচিত ছিলেন। ৪২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশিত হয়। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে এই গল্প প্রকাশিত হয়। তারাচাঁদ পরশুরাম নামে তাঁর বাড়িতে এক স্যাকরা ছিল। সেই পদবী থেকেই তাঁর এই ছদ্মনামের অবতারণা। পরশুরামের হাস্যরস মূলতঃ Satire। বৈঠকী গল্প বলার রীতি পরশুরামের। তাঁর গল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গ। সমকালীন সমাজের এমন কোনও বিষয়, জীবনের এমন কোনও দিক নেই যা ব্যঙ্গের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। সমকালীন জীবনের নানা দুর্গতি ও দুর্নীতি পীড়িত করেছিল তাঁকে। ব্যঙ্গের আঘাতে সমকালীন ভণ্ড মানুষের মুখ থেকে মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ কারও গায়ে জ্বালা ধরায় না। সমস্ত সামাজিক মানুষই পরশুরামের ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ। এইভাবেই তিনি ব্যঙ্গকে সর্বব্যাপী করে দিতে পেরেছিলেন। তিনি সমাজপতি নন। তিনি সমাজ পরিশোধনের পন্থী। কিন্তু তাই বলে তিনি সমাজ সংস্কারক নন। অসঙ্গতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। কিন্তু শাস্তি দেন না। প্রতিকার করেন না। তিনি শিল্পী মানুষ। তাঁর ব্যঙ্গ থেকে কোনও স্তরের মানুষ বাদ পড়ে না। ব্যঙ্গের জাল ছড়ানো সর্বত্র। তাঁর গল্পগুলি চরিত্রের চিত্রশালা। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মুন্সীয়ানা চোখে পড়ার মতো। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয়, তাকে বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সে হয়ে ওঠে সামাজিক চরিত্র।

কোনও কোনও গল্পে ব্যক্তি রাজশেখর ও শিল্পী পরশুরাম এক হয়ে গেছেন। তিনি ব্যঙ্গ শিল্পী। কারও খোসামোদি করা মানতে পারতেন না। শিল্পীর দায়িত্ব অসঙ্গতিকে দেখিয়ে দেওয়া।

ব্যঙ্গের মাধ্যম হিসেবে তিনি সাধু ভাষাকে গ্রহণ করেছেন। কারণ সাধু ভাষায় ব্যঙ্গটা ভালো খোলে। সমাজকে কষাঘাত করার জন্য তিনি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। হালকা বিষয়ের মধ্যে তিনি বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন। ভাষাটা গুরু অর্থাৎ সাধু, কিন্তু বিষয়টা লঘু। এর মধ্যে ব্যঙ্গকে মিশিয়ে দিয়েছেন। সবরকম হাসিকেই তিনি এনেছেন তাঁর গল্পে। তা সত্ত্বেও satireই বেশি। ব্যঙ্গের মায়াজালে সবাই আটকে পড়ে।)

'লম্বকর্ণ' একটি আপাদমস্তক হাসির গল্প। পরিস্থিতি, চরিত্র, বর্ণনা এবং সংলাপ সব মিলিয়ে হাস্যরসের 'কমপ্লিট প্যাকেজ'। এই গল্পে তুচ্ছকে গুরুতর রূপে দেখিয়ে, লঘুকে ছদ্ম গাম্ভীর্যের মোড়কে আবৃত করে এবং চরিত্রের অসংগতিকে প্রকাশ করে হাস্যরস তৈরি করা হয়েছে। গল্পে অনেকক্ষেত্রেই পরিস্থিতি হাস্যরস তৈরি করেছে।

গল্পের প্রথমেই বংশলোচনের বিবরণ। চল্লিশ পেরিয়ে তিনি একটু মোটা হয়ে গেছেন। ভীষণ শরীর সচেতন। তাই ভাত রুটি ত্যাগ করে দু'বেলা শুধু কচুরি খেয়ে তিনি যথেষ্ট কৃচ্ছসাধনের পরিচয় দিয়েছেন। এমন সময় লম্বকর্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। খপ করে তাঁর হাত থেকে বর্মা চুরুট কেড়ে নিয়ে খেতে থাকে। ছাগলও তাহলে চুরুট খায়!

বংশলোচনের বৈঠকখানার বর্ণনাও অসাধারণ। কালো জমির ওপর আসমানি রঙের বেড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে কালো পশম পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বেড়ালটির এই অবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ আকাশী রঙের বেড়াল। সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে এটা বেড়াল, তাই ছবির নিচে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মানিনী দেবী ইংরেজিতে বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন CAT। মেমের ছবিতে সিল্কের ব্রাহ্ম শাড়ী এবং জোর করে তাদের নাখে নোলক পরিয়ে দিয়ে তাদের মুখের দুরন্ত মেম-মেম ভাবকে ঢাকা দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

দাম্পত্য কলহের পর স্বপ্নে বংশলোচনবাবু লম্বকর্ণকে স্ত্রী ভেবে জড়িয়ে ধরেন। পরে চোর ভেবে বাড়ি মাথায় করেন।

রাত্রিবেলায় লম্বকর্ণের ক্ষিদে পায়। দু'খানা বর্মা চুরুট খেয়ে তার ঘুম উড়ে গেছে। হাতের কাছে উপযুক্ত খাবার না পেয়ে একগোছা খবরের কাগজ সে খেয়ে নেয়। কিন্তু খবরের কাগজ অত্যন্ত নীরস হওয়ায় তার ভালো লাগে না। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় খেয়ে ফেলে। কিন্তু গীতাও একেবারেই শুকনো জিনিস। তাই তার গলা শুকিয়ে যায়। কুঁজোতে জল ছিল। কিন্তু বেচারা লম্বকর্ণ সেটা খেতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে সে রেড়ির তেল খায়। এই তেল অত্যন্ত সুস্বাদু হওয়ায় চকচক করে সে সবটা খেয়ে ফেলে।

বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড-এর লাটুবাবুর সংলাপ অভূতপূর্ব। অবশেষে লম্বকর্ণের যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র ও নব্বই টাকার নোট খেয়ে ফেলা বিচিত্র ব্যাপার। কোনও উপায় না দেখে বংশলোচনবাবু লম্বকর্ণকে জোলাপ দেবার প্রস্তাব দেন। চাটুজ্জে মশায়ের ভূতের গল্প ও ভূতের বাঘে পরিণত হওয়ার বর্ণনাও যথেষ্ট হাসির খোরাক জোগায়। সবশেষে লম্বকর্ণের বদান্যতায় বংশলোচনবাবু ও তাঁর স্ত্রী মানিনী দেবীর সন্ধি স্থাপনের ঘটনাটি পরিস্থিতিগত হাস্যরস তৈরি করেছে।

চরিত্রগত হাস্যরসের ক্ষেত্রে সমাজের এক একটি শ্রেণীর প্রতি তির্যক ব্যঙ্গ থাকলেও ব্যঙ্গকে ছাপিয়ে কৌতুক বড় হয়ে উঠেছে। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানাতে আড্ডা চললেও তিনি তাঁর পদমর্যাদা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বেলেঘাটা রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। বিস্তর তাঁর ভূসম্পত্তি। এছাড়াও তিনি একজন নামকরা 'অনারারি হাকিম' যিনি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও একমাস জেল পর্যন্ত শাস্তিরূপে দিতে পারেন। এহেন বংশলোচন কী না বৌয়ের ভয়ে ভীত! ইতিহাস তাঁকে কোনওদিন ক্ষমা করবে না। সমাজে তাঁর একটা প্রেস্টিজ আছে। তাঁর আবার কীসের নার্ভাসনেস? এহেন বংশলোচনের শ্রেণীগত আত্মম্ভরিতা এবং স্ত্রীর ভয়ে ভীত হয়ে অর্থহীন পৌরুষের আস্ফালন, গীতাপাঠ এবং সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে উপলব্ধির চেষ্টা, নিজের কৃত কর্মের পক্ষে যুক্তি সাজানো প্রভৃতি এই গল্পে হাস্যরসের আমেজ তৈরি করেছে। উদয় চাটুজ্জের পারিষদ সুলভ চাটুকারী বৃত্তি এবং তার পরিবর্তে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে আদায় করার মনোভাবকেও খোঁচা দেওয়া হয়েছে।

নামকরণের ক্ষেত্রেও হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র গল্পটির মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি ছাগল, যার নাম লম্বকর্ণ। যদিও তার অনেকগুলো নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। যেমন ভাসুরুক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ। তার মধ্যে লম্বকর্ণ নামটাই সকলের পছন্দ হয়। বংশলোচনকে কথায় কথায় তাঁর স্ত্রীর মানভঞ্জন করতে হয়। তাই তাঁর নাম মানিনী। কন্যার নাম টেঁপী এবং পুত্র ঘেণ্টু। দারওয়ান চুকন্দর সিং। প্রতিটি চরিত্রের নামকরণের মধ্য দিয়ে হাসির আভাস পাওয়া যায়।

বর্ণনাগত হাস্যরস রয়েছে সমগ্র গল্পে। যেমন লম্বকর্ণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে – "কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কচি পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু"। দারোয়ানের বর্ণনাও অদ্ভুত। "শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি পাকালো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো তার নাম"।

গল্পের শেষে লম্বকর্ণর সুবাদে বংশলোচন প্রাণে বেঁচে যান। তাই মানিনী দেবী আপ্লুত হয়ে লম্বকর্ণর সিং 'ক্যামিকেল সোনা' দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তার জন্য সাবান ও ফিনাইলের ব্যবস্থা করা হলেও তার গা থেকে বঁদা পাঁঠার দুর্দান্ত গন্ধ বাদ দিতে পারেননি। এরকম প্রতিটি বর্ণনাই হাসির মোড়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এরপর আসা যাক সংলাপগত হাস্যরসের ক্ষেত্রে। গল্পের শুরুতেই বংশলোচনের কাছে থেকে বর্মা চুরুট কেড়ে নিয়ে লম্বকর্ণ জিজ্ঞাসা করে – 'অর-র-র'? অর্থাৎ আর আছে? মানিনী দেবী প্রথম থেকেই ছাগলের ওপর চরম বিরক্ত। তিনি ছাগলকে বাইরে তাড়ানোর জন্য যে হিন্দী ভাষায় চুকন্দর সিংকে আদেশ করেন, তা অতি ভয়ঙ্কর-

"ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা"।

আশা করা যায়, বাড়ির গিন্নীর থেকে বাড়ির কর্তা একটু ভালো হিন্দী বলবেন। কিন্তু সেখানেও তথৈবচ অবস্থা-

"দেখো চুকন্দর সিং এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা"।

বংশলোচনের পারিষদরা সকলেই লম্বকর্ণকে খেয়ে তাদের রসনা পরিতৃপ্তি করতে চায়। কিন্তু বংশলোচন শরীর সচেতন হওয়ার পর থেকে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সেই শুনে বিনোদের দার্শনিক সুলভ উক্তি-

"হ্যাঁ হে বংশু প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব পাঁঠায় পৌঁছেছে না কি?"

লম্বকর্ণ শেষ পর্যন্ত বংশলোচনের পরিবারেই থেকে গেছে এবং পরম যত্নের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। লোকে দূর থেকে তাকে বিদ্রূপ করে। সে সমস্ত নীরবে শুনে যায় এবং উপেক্ষা করে। ছাগল বলে কি তার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু নেই? সেও জানে মানুষের সব কথা ধরতে নেই। বলছে বলুক। সে ওসব ছোটখাটো কথাকে পাত্তা দেয় না। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করলে বলে- 'ব-ব-ব' অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

যে সময় দাঁড়িয়ে পরশুরাম গল্প লিখেছেন, সেই সময়কে সমকালীন রাজনীতিকে তিনি তাঁর বিভিন্ন গল্পে তুলে এনেছেন। পরশুরামের পাশাপাশি সেই সময় সাহিত্য সৃষ্টি করছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ। সেই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে হাসির গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যিক তথা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকেও বিদ্রূপ করতে তিনি ছাড়েননি। কোনও সাহিত্যিক সমাজকে বাদ দিয়ে কিছু লিখতে পারেন না। সমাজকে ব্যঙ্গ করা গল্পকারদের উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে পরশুরাম মিশিয়ে দিয়েছিলেন বৈঠকী রীতির গল্প। গল্প বলতে গিয়ে যে চরিত্রগুলো উঠে আসে তাদের অসংগতি দেখিয়ে হাস্যরস তৈরি করেছিলেন।

এক একটা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। কখনও মহাভারতের জাবালী, কখনও রামায়ণের হনুমান। কখনও তাঁর ব্যঙ্গের বিষয় সমাজের যুব সম্প্রদায়, কখনও ভণ্ড বাবাজী। কখনও তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র মনুষ্যেতর প্রাণী যেমন বাঘ দক্ষিণ রায় বা ছাগল লম্বকর্ণ। কখনও বা ভূত সম্প্রদায়। কখনও সমাজের ধ্বজাধারী রাজনীতিবিদরা।

প্রচলিত গল্প লেখার আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। অনাবিল হাস্যরসের গল্প। তার সঙ্গে ব্যঙ্গের বিদ্রূপ থাকলেও তা কখনই জ্বালাময়ী নয়।

লেখিকা : অন্তরা চৌধুরী

Source : kalimationline.blogspot.com

* underline অংশটি বাদ দিতে পারো